জুমাদাল উলা মাসের করণীয় বর্জনীয়

মুসলমান আমল থেকে কখনো খালি থাকে না। প্রতিটি মূহুর্ত তার আমলে কাটে। একজন মুসলমানের সবচেয়ে বড় আমলহলো মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল থাকা। সময়ের দিকে লক্ষ্য করে এই মাসে বিশেষ কোন আমল না থাকায় মুমিনের সবচেয়ে মূলবান জিনিস ঈমান-আক্বীদার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

তাওহীদ-রিসালাতের হাকীকত ও তাৎপর্য

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ

তরজমা; ‘হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার রাসূল এবং তার সাথীগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং নিজেদেরে মাঝে পরস্পর সহানুভূতিশীল।’ (সুরা ফাতহ:২৯)

বর্ণিত আয়াত হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে নাযিল হয়। হুদাইবিয়ার সন্ধিকে প্রকাশ্য বিজয় বলে ঘোষণা করা হয়। যদিও বাহ্যিক ভাবে বিজয়ের কোন চিহ্ন তাতে বিদ্যমান ছিল না। যে কারণে হযরত উমর ফারুক রাযি. সহ অন্যান্য সাহাবীগণ এ সন্ধির ব্যাপারে খুবই পেরেশান ছিলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তা‘আলা এ সন্ধির অনেক হেকমত প্রকাশ করলেন। সুলহে হুদাইবিয়ার পরপরই খাইবার বিজয় হয়ে গেলো। প্রচুর গনীমত মুসলমানদের হাতে এসে এতদিনের আর্থিক সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। অপর দিকে ইয়াহুদী জাতি সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হলো এবং সময়ের ব্যবধানে মক্কা বিজয় হয়ে চরম ও পরম লক্ষ্য অর্জিত হলো।

হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্র প্রস্তুতকালে কাফেরদের অযৌক্তিক শর্ত

সুলাহনামা (সন্ধিপত্র) প্রস্তুতলগ্নে মক্কায় কাফেরদের পক্ষ থেকে অনেকগুলো অবাঞ্ছিত কার্য ও অযৌক্তিক শর্ত উত্থাপিত হয়েছিল। তার মধ্যে তাদের দু‘একটি উল্লেখযোগ্য কার্যকলাপ হলো সুলাহানামার শুরুতে হযরত আলী রাযি. ‘বিসমিল্লাহ’ শরীফ লিখেছিলেন। কিন্তু কাফেররা তা মানলো না। তারা বরং বলে বসলো-রহমান কে? তাকে আমরা চিনি না। সুতরাং আমাদের নিয়ম মতো “বিসমিকা আল্লাহুম্মা” লিখতে হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে তাই লেখা হলো। তারপর হযরত আলী রাযি. লিখলেন-এটা একটি চুক্তিনামা, যা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীদের সাথে সম্পাদন করলেন। কাফেররা এতে আপত্তি করে বসলো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যদি আমারা আল্লাহর রাসূল মেনেই নেই, তাহলে তার সাথে আমাদের বিবাদ কিসের? তাহলে তো সমস্ত ঝগড়ার অবসান হয়ে যায়। সুতরাং উক্ত রাসূলুল্লাহ শব্দের স্থলে ‘মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ’ লিখতে হবে।

এ দাবি নিয়ে তারা খুবই পীড়াপীড়ি ও বাড়াবাড়ি করতে লাগলো। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে তাদের দাবি মেনে নিয়ে ‘রাসূলুল্লাহ’ শব্দটি মুছে ফেলা হলো এবং তদস্থলে “বিন আব্দুল্লাহ” লেখা হলো। দ্বীনের স্বার্থে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিনয় ও নম্রতার এই প্রকাশ আল্লাহ তা‘আলার দরবারে সমাদৃত হলো। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বিধান [যে ব্যাক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন] অনুযায়ী এ আয়াতের মধ্যে বিশেষভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামের সাথে রাসূলুল্লাহ্ শব্দ নাযিল করে চিরস্থায়ী করে দিলেন-যা কিয়ামত পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষ কর্তৃক লিখিত ও পঠিত হতে থাকবে।

মুহাম্মাদ নামের সার্থকতা

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা‘আলা বিভিন্ন নামে ভূষিত করেছেন। তার মধ্যে ‘মুহাম্মাদ’ নামটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ নামটি আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে পাকের চার স্থানে উল্লেখ করেছেন এবং এ নামটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মের পূর্বেই তাঁর দাদা খাজা আব্দুল মুত্তালিবকে স্বপ্নের মাধ্যমে জানানো হয়েছিল। আর এ নামের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ হবে হাশরের ময়দানে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সকল মানুষের জন্য সুপারিশের লক্ষ্যে মাকামে মাহমূদে উপস্থিত হয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করবেন এবং আল্লাহ তা‘আলা সেই সুপারিশ কবুল করে হিসাব শুরু করবেন। ইতিপূর্বে সব মানুষ সকল বড় বড় রাসূল আ. গণের দরবারে গিয়ে ফিরে আসবে, কেউ তাদের সুপারিশের যিম্মাদারী নিতে সাহস করবেন না, ঠিক এমনই মুহূর্তে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাফা‘আতের যিম্মাদারী গ্রহণ করায় এবং শাফা‘আত করায় দুনিয়ার শুরুলগ্ন থেকে শেষ পর্যন্ত যত মানুষের দুনিয়াতে আবির্ভাব ঘটেছে, সকলে একবাক্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন। তখন মুহাম্মাদ অর্থাৎ প্রশংসিত নামের পূর্ণপ্রকাশ ঘটবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আরেক নাম ‘আহমাদ’ অর্থ- সকলের চেয়ে বেশী প্রশংসাকারী। বাস্তবিক পক্ষে তিনি আল্লাহ তা‘আলার জন্য সবচেয়ে বেশী কুরবানী করেছেন এবং জান-মাল দিয়ে আল্লাহর সবচেয়ে বেশী প্রশংসা করেছেন। তার বিনিময়ে আল্লাহ তা‘আলার এই বিধান বাস্তবায়িত হবে যে, দুনিয়াতে যে যত বেশী আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা করবে, তার দ্বীনের জন্য যত বেশী কুরবানী করবে, আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে দুনিয়াতে ও আখিরাতে ততবেশী প্রশংসিত ও মর্যাদাশীল করবেন। তায়েফের জুলুম ও অত্যাচারের পরক্ষণেই মিরাজে আল্লাহ তা‘আলার দীদার ও সান্নিধ্য লাভ তার জ্বলন্ত উদাহরণ। আল্লাহ তা‘আলা বান্দার কুরবানী, ত্যাগ-তিতিক্ষা, কষ্ট-তাকলীফ বরদাশত ইত্যাদিও কড়া ক্রান্তি হিসাব রাখেন এবং বান্দাকে সেই অনুপাত বরং তার চেয়ে অনেক বেশী প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

কালিমা তাইয়্যেবা ও তার দাবি

আয়াতের প্রথম অংশটুকু কালিমায়ে তাইয়্যেবা ["লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"]-এর দ্বিতীয় অংশ বটে। আর কালিমা তাইয়্যেবার প্রথমাংশও বিভিন্ন আয়াতের মধ্যে উল্লেখ আছে। প্রথমাংশের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সাথে আমরা ওয়াদাবদ্ধ হয়ে যাই যে, আল্লাহ ছাড়া আমাদের আর কোন মা'বুদ নেই। অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত আর কেউই ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নয় বা অন্য কাউকে ইবাদত করার কোন সুযোগ নেই। কারণ স্পষ্ট। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রিযিক দাতা। তিনিই আমাদের কল্যাণার্থে যা কিছু দরকার সব কিছুই সম্পন্ন করেছেন, দিয়েছেন। তিনি সমস্ত উত্তম গুণের পরিপূর্ণ অধিকারী। কোন দোষ-ত্রুটি তাঁর ধাওে কাছে ঘেষতে পারেনা। তার ফয়সালা ব্যতীত অন্য কারো হাতে আমাদের উপকার বা অপকারের সামান্যতম ক্ষমতাও প্রদান করা হয়নি। সৃষ্টজীব দ্বারা বাহ্যিক ভাবে আমাদের কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধিত হলে সেটা মূলত আমাদের কর্মফলের ভিত্তিতে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। মাখলুক ও সৃষ্টজীবের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। তার ভিতরে যে ক্ষমতা বা তাছীর আমরা লক্ষ্য করি, তা মূলতঃ আল্লাহ তা'আলারই দেয়া ক্ষমতা এবং সে ঐক্ষমতা প্রকাশ করতেও আল্লাহর হুকুমের মুখাপেক্ষী। এ কারণেই আগুনেই আগুনের জ্বালানোর ক্ষমতা সর্বক্ষণ জারী থাকা সত্ত্বেও হযরত ইবরাহীম আ. কে আগুন জ্বালাতে পারেনি। বরং আরাম ও শান্তি দিয়েছিল। ধারালো ছুরির ভিতরে সব সময় কাটার ক্ষমতা লক্ষ্য করা গেলেও ঐ ছুরি ইসমাইল আ. কে কাটেনি। পানির ভিতরে ডুবানো ক্ষমতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বে ঐ পানি হযরত মূসা আ.-এর বাহিনীকে ডুবায়নি। সাহাবী হযরত আলা ইবনুল হাযরামী রাযি.-এর সেনাদলকে ডুবায়নি। এসবের একটাই কারণ, মাখলুক বা সৃষ্টজীব তার ক্ষমতা প্রকাশ করতে হলে ক্ষমতাদানকারী আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের মুহতাজ হয়। তিনি নিষেধাজ্ঞা জারী করলে, কোন মাখলুকের কোন ক্ষমতা প্রকাশ পেতে পারে না।

উপকার বা অপকার করার মালিক একমাত্র আল্লাহ

এজন্য নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. কে বললেন- হে ইবনে আব্বাস! সমগ্র দুনিয়ার মাখলুকাত যদি তোমার কোন কল্যাণ বা ক্ষতি করতে চায় অথচ আল্লাহ তা'আলা যদি না চান, তাহলে মাখলুক তোমার বিন্দুমাত্র উপকার বা ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ তা'আলা যদি তোমার উপকার বা ক্ষতি করার সিদ্ধান্ত করেন তাহলে সমগ্র মাখলুক একত্র হয়ে তা বন্ধ করতে সক্ষম হবে না। (সূরায়ে ইউনুস-১০৭)

সারকথা, আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপকার বা অপকার সাধনে কারো মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু মাখলুক কারো উপকার বা অপকার করতে সম্পূর্ণ ভাবে আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী।

শিরকে লিপ্ত হওয়া বুদ্ধিহীনতা

বিধর্মীরা কোন মাখলুকের মধ্যে ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করলে তাকে দেবতা ভেবে তার পূজা শুরু করে দেয়। এটা একবারেই অনর্থক। বস্তুত তার ঐ ক্ষমতা নিজস্ব ক্ষমতা নয়, বরং খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতা। আসল ক্ষমতাদাতা ও ক্ষমতাধরের ইবাদত না করে তাঁর অধীনস্থকে পূজা, ইবাদত করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কী হতে পারে? বস্তুত শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা প্রকাশ্য শিরক। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা হচ্ছে- "তিনি সকল গুনাহ মাফ করতে পারেন এবং তাওবাকারীর সকল গুনাহ মাফ করেও দেন, কিন্তু শিরককে তিনি কখনই ক্ষমা করবেন না।" (সুরায়ে নিসা-৪৮)

হ্যাঁ তারা যদি কালিমা পড়ে শিরক থেকে তাওবা করে নেয়, তাহলে অবশ্য তারাও ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে।

মুসলিম সমাজে প্রচলিত শিরক

উল্লেখ্য, বিধর্মীরা যেমন বিভিন্ন দেব-দেবীর ক্ষমতায় বিশ্বাসী, তেমনি ভাবে অনেক মুসলমানকেও দেখা যায় যে, তারা বিভিন্ন মাখলুকের ক্ষমতায় বিশ্বাসী। যেমন অনেকে নিজের পীরকে গায়েব জান্তা, মুশকিল কুশা, হাজতরাওয়া, প্রয়োজন পূর্ণকারী মনে করে! অনেকে মাযারবাসী বুযুর্গকে ধন-সম্পদ ও পদমর্যাদাদাতা, সন্তানদাতা ইত্যাদি বিশ্বাস করে। এসব বিশ্বাসের প্রেক্ষিতেই তারা মাযারে যায়, ওরস করে, শিন্নী করে, গাড়ী থামিয়ে সেখানে পয়সা দেয়, পয়সা উঠায়, গরু-খাসী দেয় কবরকে সিজদা করে, তাওয়াফ করে ইত্যাদি। অথচ এ সবই আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশীদার করার শিরকী গুনাহ হয়-যা আল্লাহ তা'আলা মাফ করবেন না বলে কুরআনে কারীমে ঘোষণা করেছেন।

আবার অনেক মানুষ নিজের ব্যবসা, নিজের জমি, নিজের মিল ফ্যাক্টরী, নিজের চাকুরী ইত্যাদিকে পরোক্ষ পালনেওয়ালা বা রিযিকদাতা বিশ্বাস করে, যদিও মুখে স্বীকার করে না। এসব আসবাব যখন হাত ছাড়া হয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তখন তারা হা হুতাশ করে, একবারেই ভেঙ্গে পড়ে। অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন তাদের গোমর ফাঁক হয়ে যায়। এতদিন তারা বলেছে-'জমি বা দোকান রিযিকদাতা নয়, বরং রিযিকদাতা আল্লাহ তা'আলা' এটা একান্তই তাদের মুখের কথা; দিলের বিশ্বাস নয়। নতুবা এত পেরেশানীর কী অর্থ থাকতে পারে? তার চাকুরী চলে গেছে, দোকান নষ্ট হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তো একই অবস্থায় আছেন। পেরেশানীর কি আছে? রুটি ও রুজির কোন সোর্স বন্ধ হয়ে গেলে তিনি নতুন আরেকটা সোর্স চালু করে দিবেন। তিনি কি নির্দিষ্ট একটা সোর্সের মাধ্যমে রিযিক পৌঁছানোর মুহতাজ? কখনো নয়। তিনি বনী ইসরাইলকে দুনিয়ার কোন প্রকার সোর্স ছাড়াই চল্লিশ বছর পর্যন্ত লালন-পালন করে জগতবাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন। যাতে করে আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান সহীহ হয় এবং তারা একমাত্র আল্লাহর ক্ষমতায় বিশ্বাসী হয়। তবে আল্লাহ তা'আলার প্রতি এ ধরণের মজবুত বিশ্বাস ও দৃঢ় ঈমান এমনিই হাসিল হয় না। এর জন্য ঈমানী লাইনে মেহনত জরুরী। হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাযি. যেভাবে ঈমান ও

আমালের দাওয়াতের মেহনতের মাধ্যমে অটল ঈমানের ও মজবুত আমল হাসিল করেছিলেন, আমাদেরকেও সেই একই রাস্তা গ্রহণ করতে হবে। হযরত ইমাম মালিক রহ. বলতেন-এ উম্মতের শেষাংশ পরবর্তী লোকেরা ঐ জিনিসের মাধ্যমেই ইসলাহ ও কামিয়াবী অর্জন করতে পারবে, যে জিনিসের মাধ্যমে এ উম্মতের প্রথমাংশ অর্থাৎ সাহাবীগণ রাযি. কামিয়াবী অর্জন করেছিলেন। (ফাযায়েলে আমাল-১০০৩পৃষ্ঠা)

সকল যুগের লোকেরা যেহেতু ছোটবেলা থেকেই উপায়-উপকরণ ও আসবাবের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছে, বস্তু জগতের তা'ছীর এবং বস্তু থেকে সব কিছু হয়-এ দৃশ্য দেখতে দেখতে বড় হয়েছে-এতে করে স্বাভাবিক ভাবে তাদের মধ্যে এ গলত খেয়াল ও ভুল বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে যে, চীজ ও আসবাব থেকেই সব কিছু হয় এবং বেশী বেশী মাল দৌলত, ধন-সম্পদ জমা করতে পারলেই ব্যক্তি সুখ শান্তি ও ইজ্জতের অধিকারী হয়ে যয়। আর বড় বড় পদ যেমন, রাজা বাদশাহ, উজীর-নাজীর, মন্ত্রী-মিনিষ্টার হতে পারলে মহা সম্মানী হতে পারে। সে যত বড় হয়েছে, এ ভ্রান্ত ধারনা ততবেশী তার মধ্যে বদ্ধমূল হয়েছে। অথচ এটাই (ধন লিপ্সা ও পদলিপ্সা) দুনিয়া ও আখিরাতে একটা মানুষের ধ্বংসের মূল।

সফলতার পথ

এ কারণে যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা বান্দার নাজাত ও কল্যাণের জন্য যত নবী রাসূল আ. প্রেরণ করেছেন, তাঁদের সকলের একই আহবান ছিল-يَاأَيُّهَاالنَّاسُ قُوْلُوْالَاإِلٰهَ إِلَّااللهُ تُفْلِحُوْ

'হে লোক সকল! তোমরা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে মা'বূদ হিসাবে বিশ্বাস করো, তাহলেই তোমরা কামিয়াব হবে।' একথার সারমর্ম এটাই যে, এক আল্লাহ থেকে সব কিছু হয়, চীজ ও আসবাবের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। বরং তারা সর্বোতভাবে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের মুহতাজ। সুতরাং ধন-সম্পদ ও বড় বড় পদ মানুষকে সুখ-শান্তি ইজ্জত-সম্মান কিছুই দিতে পারে না। এগুলোর মধ্যে কামিয়াবী নিহিত মনে করা মারাত্মক ধোঁকা ও সম্পূর্ণ বাস্তবতা বিরোধী।

নবীগণের আ. মূল দাওয়াত

যুগ যুগ ধরে যে গলত খেয়াল ও ভুল বিশ্বাস মানুষেরা দিলের মধ্যে লালন করে এসেছে, নবী রাসূলগণ আ. সর্ব প্রথম সেখানেই কুঠারাঘাত করেছেন এবং সে ভ্রান্ত ধারণার বেড়াজাল থেকে মানুষকে উদ্ধার করে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। চীজ ও আসবাব থেকে তাদের ঈমান ও ইয়াকীনকে হটিয়ে আল্লাহ তা'আলার উপর তাদের বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করেছেন। মুমিন বান্দাগণ তাঁদের দাওয়াতে এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়েছেন যে, আমার নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ভুল ছিলো। বস্তুত মাখলুকের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই।

সকল ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ

সকল ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আর তাঁরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ক্ষমতাকে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করেছেন। যে কারণে তাঁরা ইসলামী মুজাহিদ বাহিনীর জন্য রাস্তা করে দিতে বলেছেন নদীকে। মিসরের নীল দরিয়ার কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন-যাতে করে সে কোন যুবতীকে তার বক্ষে ডুবানো ছাড়াই আল্লাহর নির্দেশে প্রবাহিত হয়। তাঁদের অবস্থানের জন্য জঙ্গলের হিংস্র জানোয়ারদেরকে জঙ্গল খালী করে অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বাঘের মুখে থাপ্পড় মেরে পথিকদের জন্য রাস্তা ছেড়ে দিতে বলেছেন। বিষের সম্পূর্ণ বোতল খেয়ে ফেলেছেন। এক ধরণের হাজারো ঘটনা কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন পাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আল্লাহওয়ালা যখন খোদায়ী শক্তির উপর পূর্ণ বিশ্বাসী হয়েছেন, তখন মাখলুককে এভাবে তাঁরা ব্যবহার করেছেন।

তাওহীদের মর্মকথা

প্রত্যেক মানুষের উপর ফরজ, চীজ ও আসবাবের ইয়াকীন দিল থেকে বের করে সব কিছু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হওয়ার ইয়াকীন দিলের মধ্যে বদ্ধমূল করে নেয়া। এটার নামই তাওহীদ বা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া। কবরে সর্ব প্রথম এ তাওহীদের ব্যাপারেই প্রশ্ন করা হবে। এ প্রশ্নের জওয়াবে যারা কামিয়াব হবেন, তারা সামনের সকল ঘাঁটি সহজেই পার হয়ে যাবেন। কারণ, মওত পরবর্তী যিন্দেগীর সর্বপ্রথম ও সর্বোচ্চ কঠিন ঘাঁটি হচ্ছে কবর। এ ঘাঁটিতে কামিয়াব হওয়ার অর্থই হচ্ছে সম্মুখের সকল ঘাঁটিতে কামিয়াব হওয়া।

খাঁটি ঈমানের হাকীকত

শুধু মুখে কালিমায়ে তাইয়্যিবা ও কালিমায়ে শাহাদাত পড়ার নাম সহীহ ঈমান নয়। বরং অন্তরের বিশ্বাসের সঙ্গে বুঝে শুনে আমলে পরিবর্তন এনে খোদায়ী শক্তির উপর ঈমান আনার নাম সহীহ ঈমান ও খালিস তাওহীদ। এ কারণেই মক্কার কাফিররা আমাদের থেকে সুন্দর করে পড়তে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও এ কালিমা পড়তে তারা রাজী হতো না।

তারা জানতো যে, এ কালিমা শুধু পড়লে চলবে না। বরং বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আর তারা বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে বিশ্বাসের পরিবর্তন করতে রাজী ছিলো না। এই হলো কালিমার প্রথমাংশের সার সংক্ষেপ।

কালিমার দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে-"মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" যা আমাদের আলোচিত তাফসীরের মূল আয়াত।

কালিমার দ্বিতীয় অংশের তাৎপর্য

আয়াতের এ অংশের উদ্দেশ্য হলো- প্রথমাংশে যে ওয়াদা ও স্বীকারোক্তি করা হয়েছে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই, তার বাস্তবায়নের জন্য বলা হয়েছে- ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই করতে হবে। ইবাদত করার অর্থ হচ্ছে- সেগুলো কিভাবে মেনে চলতে হবে? তার ব্যাখ্যা কি হবে? এবং তার বাস্তব নমুনা কিরূপ হবে?

সে প্রশ্নের উত্তরই হলো এ দ্বিতীয় অংশ, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হুকুমের ব্যাখ্যা ও তার বাস্তব নমুনা, "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।" তিনি নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর দীর্ঘ তেইশ বছরের জীবনে যা কিছু বলেছেন বা করেছেন, তা সবই আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকামের ব্যাখ্যা ও বাস্তব নমুনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা নামায কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নামায কত ওয়াক্ত, কত রাকাআত এবং পড়ার পদ্ধতি কি? তা সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতের ওপর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত ও হাদীসসমূহ বাদ দিয়ে আল্লাহ পাকের একত্ববাদ বা কালিমার উপরে আমল করার দুনিয়াতে কোন পথ নাই। কালিমার দ্বিতীয় অংশের সার এটাই যে, একমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকার মধ্যেই কামিয়াবী এবং শান্তি নিহিত রয়েছে। এর বাইরে দুনিয়াতে যত তরীকা বা তন্ত্র-মন্ত আছে, তার কোনটার মধ্যে শান্তি ও কামিয়াবী নেই। বরং এসবই অচল। কিছু দিনের মধ্যে এগুলোর অসারতা প্রকাশ পাবে।দ্বিতীয়তঃ এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, হাদীস ও সুন্নাহ হচ্ছে কুরআনে কারীমের ব্যাখ্যা ও তাফসীর। এটাকে বাদ দিয়ে দ্বীনের ওপর চলার কোন রাস্তা নেই।

আল্লাহ আমাদের বুঝে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন